অর্থনীতির ৫ বছর একটি সমীক্ষা

নাগরিক মঞ্চ

NAGARIK MANCHA

পাখি সব করে রব, রাত্রি শেষ : ঘোষণা চৌদিকে,
ভোরের কাকলি শুনি; অন্ধকার হয়ে আসে ফিকে,
আমার ঘরেও রুদ্ধ অন্ধকার, স্পষ্ট নয় আলো,
পাখিরা ভোরের বার্তা অকস্মাৎ আমাকে শোনালো।

অদূরে হঠাৎ বাজে কারখানার পাঞ্চজন্যধ্বনি,
দেখি দলে দলে লোক ঘুম ভেঙে ছুটেছে তখনি;
মনে হয়, যদি বাজে মুক্তি-কারখানার তীব্র শাঁখ
তবে কি হবে না জমা সেখানে জনতা লাখে লাখ?
জন-পাখিদের গানে মুখরিত হবে কি আকাশ?
— ভাবে নির্বাসিত মন, চিরকাল অন্ধকারে বাস

ছবি : দেবব্রত মুখোপাধ্যায়, কবিতা : সুকান্ত ভট্টাচার্য (জনরব (অংশ) : ঘুম নেই)

প্রকাশকাল - এপ্রিল ২০১৯

প্রকাশক - পবন মুখোপাধ্যায়
১৩৪, রাজা রাজেন্দ্র লাল মিত্র রোড
কলকাতা - ৭০০ ০৮৫
ই-মেল : nagarickmancha@gmail.com
ওয়েবসাইট : www.nagarickmancha.org
ফোন : ০৩৩-২৩৭৩ ১৯২১
ফ্যাক্স : ০৩৩-২৩৭৩ ১৯২১
মোবাইল : ৯৮৩১৩১৮২৬৫

অনুদান : কুড়ি টাকা

মুদ্রিত : নবারুণ প্রেস, ১৯, বুদ্ধ ওস্তাগর লেন, কল-৯
মোঃ ৯৮৩০১৮০০৩৯

আমাদের মতামত

সিদ্ধান্ত আপনার

নাগরিক মঞ্চ বিগত সময়ে নির্বাচনের সময় সরকারের কার্যকাল সময়ের এইভাবেই মূল্যায়ন করেছে। বিষয় থাকে জনগণের কর্মসংস্থানে, রোজগার, শ্রমজীবী মানুষের কাছে পাঁচ বছরে শাসকের প্রতিশ্রুতি, প্রাপ্তি, প্রত্যাশা। আমরা এসব নিয়েই বিশেষজ্ঞ, অর্থনীতি চর্চায় যারা নিরলস কাজ করছেন, এছাড়া শ্রমজীবী মানুষদের নিয়ে কাজ করেন এমন নানান ক্ষেত্রের সমাজকর্মীর মতামত তুলে ধরব। আলোচনায় মতামতের ভিন্নতা আছে। প্রাসঙ্গিক লেখায় তার কিছু কিছু ছাপ পাওয়া যাবে।

আলোচনা হয়েছে

- কর্মসংস্থান নিয়ে সরকারী তথ্য নেই। বিশেষজ্ঞ সংস্থার কাজকে প্রকাশ করতে দেওয়া হচ্ছে না।
- দেশে জি.ডি.পি বেড়েছে। কর্মীর প্রকৃত আয় কমেছে।
- কাজের সুযোগ - কার্যকরী চাহিদা বৃদ্ধি হয়নি। রপ্তানি বাণিজ্য সংকুচিত হয়েছে।
- সংগঠিত শিল্পে প্রত্যাশিত মুনাফা কমেছে।
- সঞ্চয় কমেছে, বিনিয়োগ কমেছে। ব্যবসায়ী সুদিন দেখছে না।
- বিদেশি পুঁজি বাড়ছে তবে তা মূলত স্টক মার্কেট নির্ভর।
- কৃষি পণ্যের দাম কৃষক পাচ্ছে না, উৎপাদন খরচ, উৎপাদক তুলতে পারছে না। কৃষকের আত্মহত্যা যারই ফলাফল।

- জি.ডি.পি বেড়েছে। মাথাপিছু আয় বেড়েছে, একইসাথে আয় বন্টনে বৈষম্য বেড়েছে, উচ্চকোটির ১ শতাংশ মানুষের ২১ শতাংশ আয় বেড়েছে। দারিদ্র্য রেখার নীচে ২০ শতাংশ মানুষের আয় বৃদ্ধি ১ শতাংশের কম।
- দ্রারিদ্র্যসীমার নিচে আছেন তাদের দৈনিক আয় ৩০ টাকার কম।
- রাষ্ট্র সংঘের দ্বারা (২০ মার্চ, ২০১৯) প্রকাশিত সুখানুভব রিপোর্ট (HDI) অনুযায়ী বিশ্বে ১৫৬টি দেশের মধ্যে ভারতের স্থান ১৪০। অর্থাৎ অধিকাংশ মানুষ ভাল নেই। তাদের 'অচ্ছে দিন' আসেনি।
- সরকারী দাবী ২০১৮-২০১৯, ১৭ মাসে দেশে ৭৬ লাখ কর্ম সংস্থান হয়েছে। অথচ অর্থনীতির তত্ত্ব অনুযায়ী Employment দিতে গেলে Capital Output Ratio দেখাতে হবে। বিনিয়োগ নেই — কর্মসংস্থান কোত্থেকে হবে?
- শ্রমিকের হাত আছে কাজ নেই। কাজ আছে ভাত নেই। আইনে প্রশাসনিক বিজ্ঞাপনে ঘোষণায় সামাজিক সুরক্ষার কথা বলা হয়। অথচ পশ্চিমবঙ্গে ফ্যাক্টরীতে রেজিষ্টার্ড কর্ম সংস্থান ধরে এক হিসাবে নাগরিক মঞ্চ দেখিয়েছে গত ২১ বছরে ৪ লাখ ২৩ হাজার শ্রমিক কর্মরত অবস্থায় কারখানার ভেতরে শারীরিকভাবে আহত হয়েছেন। কারুর পা গেছে, কারুর হাত গেছে, আঙ্গুল গেছে। এভাবেই বছর বছর ২৫০০ শ্রমিক অর্দ্ধ প্রতিবন্ধী হিসাবে ই.এস.আই. আওতায় ক্ষতিপূরণের আবেদন করে। প্রায় ৭৫০ জনের মত শ্রমিক কাজ করতে করতে কারখানার ভেতরে অজ্ঞান হয়ে নিহত হয়েছেন। এর কোনো বিচার নেই।
- নির্বাচন আসে, নির্বাচন যায়, এসব নিয়ে কথা হয় না।

আমাদের পুস্তিকায় প্রকাশিত মতামত অনেকটাই হয়ত আপনাদের জানা বোঝা অভিজ্ঞতার মধ্যে। তবু একবার মনে পড়িয়ে দেওয়া আর কি। ভেবে দেখবেন। তবে হ্যাঁ একটা বিষয় স্পষ্ট করেই বলে রাখি, গ্রহণ, বর্জন, ভাললাগা তর্ক করা, মেনে নেওয়া বা ফেলে দেওয়া সব আপনার স্বাধীনতা। সাংবিধানিক অধিকার। আর যাই হোক যে বা যারা এসবে জোরজবরদস্তি হস্তক্ষেপ করছে, আমরা তার বিরোধী।

ভাল থাকবেন —

নব দত্ত

সম্পাদক, নাগরিক মঞ্চ

এই সরকার ও শ্রমিক শ্রেণী

শুভেন্দু দাশগুপ্ত

বর্তমান ক্ষমতায় থাকা বিজেপি সরকার যার ডাক নাম মোদি সরকার, সেই সরকারের আমলে শ্রমিকদের হাল নিয়ে দু-চার কথা লিখতে বলা হয়েছে। রাজি হয়ে মুস্কিলে পড়েছি।

টেলিভিশন দেখিনা, মোবাইল ফোন নেই, ফলে তার মধ্যে দিয়ে আসা খবর মতামত তথ্য দেখা হয় না।

পড়ার মধ্যে পড়ি খবরের কাগজ, ঠিক পড়িনা, চটপট চোখ বুলিয়ে যাই, শ্রমিক বিষয়ে তথ্য পাইনা।

আর ছোটো পত্রিকা যতটুকু পাই, শ্রমিক নিয়ে তেমন লেখা দেখিনা।

শ্রমিক বিষয়ে দরকারি তথ্য কীভাবে পাওয়া যাবে জানি না। আর পেলেও যে সেটা ঠিকঠাক তথ্য তারও কোনও নিশ্চয়তা নেই। দরকারি তথ্য নিয়ে যা কান্ডকারখানা চলছে এখন।

নিজের উদ্যোগে একবার এই সরকারের বানানো শ্রমিক বিষয়ক নানা আইন আগের আইন বদল এসব যোগাড় করেছিলাম একটা ছোটো বই লেখার জন্য। তাতে দেখিয়ে ছিলাম যা যা আগের আইন, বিধান, নিয়ম পাল্টানো হয়েছে তা শ্রমিক বিরোধী। আমি ১১টা উদাহরণ দেখিয়ে ছিলাম। ফ্যাক্টরিজ অ্যাক্ট ১৯৪৮, পেমেন্ট অফ ওয়েজেস অ্যাক্ট-১৯৬৫, ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিসপিউট অ্যাক্ট-১৯৪৭, লেবার লজ্ (এগজেমসান ফ্রম ফার্নিসিং রিটার্ণস অ্যান্ড মেনটেনিং রেজিস্টারস বাই সার্টেন এসটাব্লিসমেন্টস) অ্যাক্ট ১৯৮৮, অ্যাপ্রেনটিসেস অ্যাক্ট ১৯৬১, ইকুয়াল

রেমুনারেশন অ্যাক্ট ১৯৭৬, কনট্রাক্ট লেবার (রেগুলেশন অ্যান্ড অ্যাবোলিশন) অ্যাক্ট ১৯৭০, ট্রেড ইউনিয়নস্ অ্যাক্ট ১৯২৬, দি স্মল ফ্যাক্টরিজ (রেগুলেশন অফ এম্‌প্লয়মেন্ট অ্যান্ড কন্ডিশনস অফ সার্ভিসেস) বিল ২০১৪। আমি বদলগুলো আলোচনা করে দেখিয়েছিলাম সবই শ্রমিকদের বিপক্ষে, পুঁজি ও রাষ্ট্রের পক্ষে।

বিজেপি সরকারের একটি শ্লোগান, 'ইজ অফ ডুয়িং বিজনেস'। ব্যবসা করাকে 'সহজ' করে দেওয়া। পুঁজির বিনিয়োগ, উৎপাদন, ব্যবসা, বাণিজ্য, বিদেশি পুঁজির আসা সব 'সহজ' করে দেওয়া। আর একটি স্লোগান 'মেক ইন ইন্ডিয়া' ভারতে বানানো, বিদেশী পুঁজিকে ডাকা ভারতে বানাতে। আর এসব করার জন্য শ্রমিক বিষয় আইন, নীতি, বিধান পুঁজির সহায়ক করে তোলা, শ্রমিকদের বিপক্ষে বানানো।

পুঁজির যুক্তি সরাসরি। প্রচলিত শ্রম আইন উন্নয়ন-এর পথে বাধা। উন্নয়ন-এর পথে বাধা সরাতে শ্রম আইন বদল।

এই বদলটাকে বলা হচ্ছে জাতীয় স্বার্থে। আসলে পুঁজির স্বার্থে। 'জাতি' আর 'পুঁজিপতি' একই মানে বানিয়ে দেওয়া হচ্ছে। 'জাতি' আর 'শ্রমিক' এক নয়।

এই ক'দিন আগে কাগজে দেখলাম শ্রমিক চিকিৎসা বিষয়ক যে সরকারি ব্যবস্থাপনা যার ডাক নাম 'ইএসআই স্কিম', তা বদলে ফেলা হচ্ছে। সব স্বাস্থ্য/চিকিৎসা ব্যবস্থার মতন শ্রমিক চিকিৎসা ব্যবস্থাপনা সরকার থেকে বেসরকারে দিয়ে দেওয়া হবে।

অন্য কথায় আসি। এই সরকারের আমলে ক'টি নতুন কারখানা বানানো হলো, ক'টি চালু কারখানা বন্ধ করে দেওয়া হলো, ক'টি বন্ধ কারখানা খোলা হলো, এই তথ্য চাইলে পাবো কোথায়?

নানা ধরনের বেসরকারি সংস্থার তথ্যে জানতে পারছি নোট বাতিল কাণ্ডে অনেক ছোট উৎপাদন বন্ধ হয়ে গেছে। ছোটো উৎপাদনে থাকা শ্রমিক কাজ হারিয়েছেন। কিন্তু হিসেব পাইনি, সরকার এমন সব তথ্যের বিরোধিতাও করেনি।

নতুন কর ব্যবস্থা জি.এস.টি-তে অনেক ছোটো ব্যবসায়ী ব্যবসা ছেড়ে দিয়েছে। ব্যবসায়ী ব্যবসা ছাড়লে উৎপাদন মার খাবে। উৎপাদন মার খেলে শ্রমিক মার খাবে।

এই রকম একটা তথ্য নানা লেখায় পাওয়া যাচ্ছে। কৃষির অবস্থা খারাপ। কৃষির অবস্থা খারাপ হলে কৃষির সাথে জড়িয়ে থাকা লোকজন গ্রাম ছেড়ে চলে আসে শ্রমিক হবে বলে। লেখায় বলা হচ্ছে কৃষি শ্রম থেকে অকৃষি শ্রমে চলে আসা প্রায় বন্ধ।

এখন আবার আরেক মুস্কিল। এখন 'শ্রমিক' এই বর্গে তো শুধু কারখানার সংগঠিত ক্ষেত্রে থাকা শ্রমিক বোঝায় না। এখন তো ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে কত রকমের কাজে থাকা লোকজনকে 'শ্রমিক' বলা হচ্ছে তার হদিশ পাওয়া মুস্কিল। এতে লাভ যারা শ্রমিককে কাজে লাগায়, মালিক তাদের। এই ভাঙ্গাভাঙ্গিতে যদি আসলে শ্রমিককে সরকারি 'শ্রমিক' সংজ্ঞার বাইরে নিয়ে আসতে পারে, তাহলে মালিকদের আর শ্রমিকদের সরকারি নিয়ম মাফিক পাওনা গণ্ডা দিতে হবে না। লাভ মালিকের। লোকসান শ্রমিকের। এমনই ছক বানিয়ে দিয়েছে, দিচ্ছে সরকার।

ফলে কত ধরনের কাজে কত ধরনের শ্রমিক নিযুক্ত আছেন তার তথ্য কোথায় পাবো? সে কাজে আগে কতজন ছিলেন, এখন কতজন আছেন, এমন তথ্য কোথায় পাবো?

আবার কারখানার শ্রমিক যদি কমে যায়, এবং অ-কারখানার শ্রমিক যদি আদৌ বেড়ে যায় তারই হিসেব পাবো কোথায়? তবে সাধারণভাবে কাজ কমে যাওয়ার যেসব বে-সরকারি তথ্য পাওয়া যাচ্ছে তার সাথে মিলিয়ে বলা যেতে পারে অ-কারখানার শ্রমিকও কমেছে।

এর সাথে যোগ করে নিই সরকারের কাজের জায়গাগুলো বন্ধ করে দেওয়া। নয়তো বেসরকারে দিয়ে দেওয়া। আর সরকার থেকে বেসরকারে গেলে প্রথম কাজ শ্রমিক কমিয়ে দেওয়া। পশ্চিম বাংলায় তো বেশ কটি বড়ো সরকারি কারখানা বন্ধ করে দেওয়া হলো। অন্য রাজ্যেও নিশ্চয়ই। সব খবর তো পাওয়া যায় না।

এখানেও প্রশ্ন রাখা, এই সরকারের আমলে কটি সরকারি কারখানা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। আর কটি সরকারি কাজের জায়গা বে-সরকারে দিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই তথ্য চাইলে পাবো কোথায়?

এই সরকারের বিরোধী যারা, তারাও যে শ্রমিক নিয়ে ভাবে তেমনটাও তো দেখিনা। এই যে, সব দলের নির্বাচনে জিতলে এই করবো, সেই করবো-র তালিকা বেরচ্ছে তাতেও তো দেখিনা শ্রমিকদের বিষয়ে এই করবো সেই করবো-র কথা।

আর একটা কথা মাথায় এলো বলে বলছি। এখন সব দলের, সরকারে থাকা দল, সরকারে যেতে চাওয়া দলের কাজের তালিকায় দেখছি নানা ধরনের অনুদান, ভরতুকি, দান, খয়রাতির কথা। কোনটারই সাথে উৎপাদনের সরাসরি সম্পর্ক নেই। ফলে শ্রম তৈরি, শ্রমিক নিয়োগের সরাসরি সম্পর্ক নেই।

অন্যভাবেও দেখা যায়। এই সরকারের কোনও নীতি ছিল না বাইরে থেকে আসা পণ্যের উপর নিষেধ বিধি চাপিয়ে দেশে থাকা পণ্য

উৎপাদনকে জোরদার করা বিষয়ে। বরং বাইরে থেকে আসা অবাধ পণ্যের চাপে ঘরের উৎপাদন মার খেয়েছে। উৎপাদন মার খেলে শ্রমিক মার খাবে, মার খেয়েছে।

আর একটা দিক দিয়ে ভাবি। একটা চালু কথা এই যে, এখন সরকারে থাকা দলের রাজনীতির ভিত হলো ব্যবসাদার। আর ব্যবসাদারদের দল হলেই যে উৎপাদকদের দল হবে তার কোনও মানে নেই। ফলে উৎপাদনে জোর নেই। উৎপাদনে জোর নেই, তাই শ্রমিক নেই।

যেহেতু হাতে কোনও তথ্য নেই, তাই এদিক দিয়ে ওদিক দিয়ে বোঝার চেষ্টা করলাম। এপাশ ওপাশ দিয়ে ধরার কায়দা করলাম। যতটুকু পারলাম, তাতে এটা বলা যেতে পারে এই সরকারের আমলে আর যাই হোক না কেন (যা হয়েছে তা আমরা হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছি, পাচ্ছি) উৎপাদন বাড়েনি, শ্রম বাড়েনি, শ্রমিক বাড়েনি, বরং কমেছে।

যেটা আগেই বললাম, আবার বলছি, এতো হলো একটা দিক। অন্য একটা দিক দিয়েও ভাবা দরকার। এই সরকারে থাকা দলটিকে হারিয়ে দিতে চায় যেসব দলেরা, তারাও যে খুব একটা শ্রম নিয়ে, কারখানা নিয়ে, শ্রমিক নিয়ে ভাবে এমনটাতো শুনিনা, দেখিনা।

যদি কেউ আমাকে বকে আমার দেখাটাই ভুল, তাহলে খুব খুশি হয়ে মেনে নেবো।

এই সব দলেরা কেন্দ্রে অথবা রাজ্যে কোন একটা সময়ে, যে সময়ে আমার একটু জ্ঞানগম্যি হয়েছে, ক্ষমতায় তো ছিল। তখন তো এমন কিছু দেখিনি যাতে মনে হতে পারে এরা সব শ্রম নিয়ে, উৎপাদন নিয়ে কারখানা নিয়ে, শ্রমিক নিয়ে ভাবে। যদি কোনো দলের কোনো

মাতব্বর হিসেব টিসেব দেখিয়ে বলে দেন আমি ভুল, সবচেয়ে খুশী হবো আমিই।

একটা কথা দিয়ে শেষ করি। যা হয়তো এই লেখাতে অপ্রাসঙ্গিক মনে হবে অনেকের। আমার থেকে কয়েক বছরের বড়ো আমার এক বন্ধু, যে নিজে রাজনৈতিক কর্মী ছিল, যার রাজনীতি নিয়ে পড়াশোনা আছে, একদিন আমাকে বললো, শ্রমিক শ্রেণীর নিজের একটা দল থাকা দরকার ছিল, দরকার আছে।

নানা সংগঠন আর বন্ধুদের সাথে জড়িয়ে থেকে যারা শ্রমিকদের নিয়ে সংগঠন করেন, ভাবনাচিন্তা করেন, কাজকর্ম করেন, তাদের সাথে যতটুকু হোক থেকে এখন আমার মতও এইরকম।

সুযোগ পেলাম তাই বলে রাখলাম। যদি কখনও কেউ কারা কথাটাকে এগিয়ে নিয়ে যায়। ❐

গত পাঁচ বছরের অর্থনৈতিক অবস্থা ঃ একটি সমীক্ষা

দেবদাস ব্যানার্জী

দেশের সামনে আজ অন্যতম সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে রুজি ও রোজগার। সরকারী পরিসংখ্যানের মারপ্যাঁচে বা অপ্রতুলতার কারণে বা স্বচ্ছতার অভাবে এই সমস্যা সমাধানে দিশা কম, ধন্দ বেশী। কিন্তু, শাক দিয়ে তো আর জ্যান্ত মাছ ঢাকা দেওয়া যায় না!

বছরে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে প্রায় ১.১ শতাংশ হারে। এর মধ্যে সবাই না হোক্ প্রায় এক বা সওয়া এক কোটি মানুষ প্রতি বছর শ্রমের জোগান বৃদ্ধি করছে। আর, বিগত বছরের কর্মহীন তো রয়েছেই। সব মিলিয়ে প্রায় ১ শতাংশ হারে কাজের সুযোগ বাড়াতে হলে প্রয়োজন বিনিয়োগ বৃদ্ধি। এর হার কত হওয়ার প্রয়োজন তা নির্ভর করে ভৌতপুঁজি (physical capital) এবং উৎপাদন (ICOR) এর আনুপাতিক হার এর উপর। যদি পুঁজি-নিবিড় যন্ত্রায়ন বেশি হয়ে থাকে, অন্য কথায়, ICOR বেশি হয় তাহলে বুঝতে হবে স্বল্প পরিমাণ উৎপাদন বৃদ্ধি করতে হলেও অনুপাতে অনেক বেশি হারে বিনিয়োগ বৃদ্ধি করতে হবে। তবেই যোগ হবে নতুন কাজের সুযোগ।

সহজ কথায়, ১০০ টাকা পুঁজি সম্বল করে তেলে ভাজার দোকান খুলে ১ জনের রুজি-রোজগার হতে পারে তা-ও যদি প্রতিযোগীতা কম থাকে। বা, ৫-১০ হাজার বাড়িতে পুঁজি বিনিয়োগ করে কৃষিক্ষেত্রে বাড়তি কর্মসংস্থান সৃষ্টি হতে পারে। বা, ১ লক্ষ টাকা বাড়তি বিনিয়োগ করে ক্ষুদ্র শিল্পে বাড়তি একজনের কাজের সুযোগ হতে পারে। সেখানে

হয়তো ন্যূনতম ১০ কোটি টাকা বাড়তি বিনিয়োগ করলে অত্যাধুনিক বৃহৎ শিল্পে অতিরিক্ত একজনের কর্মসংস্থান হতে পারে। অর্থাৎ, কৃষি ক্ষেত্রে, ছোট ও মাঝারি শিল্প গুরুত্ব না পেলে, বর্তমান ভারতে অনেক অনেক নতুন কাজের সুযোগ সৃষ্টি করা যাবে না। কেননা বৃহৎ শিল্পে চলছে কর্মী ছাঁটাই আর যন্ত্রায়ন।

দেশে বিনিয়োগ বৃদ্ধি করতে প্রয়োজন দু'টি প্রাথমিক শর্ত পূরণ ঃ (১) বাজারে কার্যকরী চাহিদা থাকতে হবে; আর, (২) দেশে যথেষ্ট সঞ্চয় (saving) থাকতে হবে; না'হলে বিদেশী পুঁজির উপর নির্ভর করতে হবে।

প্রথমত, নানা ধরনের কম সুদে ঋণ নেওয়ার ব্যবস্থা তো কেন্দ্রীয় সরকার করেছে, কিন্তু কার্যকরী চাহিদার অভাবে সুরাটের হীরা শিল্প, কোয়েম্বাটোরের ছোট ও মাঝারি ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প, বা ইন্দোরের পোষাক শিল্প ধুঁকছে। বহু সংস্থা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। আর অন্যত্র চলছে কর্মী ছাঁটাই। তো ঋণ নিয়ে করবে কী?

এখানে বলা প্রয়োজন যে NSSO-র Employment & Unemployment Survey Report ২০১৬-১৭ প্রকাশিত হলে কর্মসংস্থান-এর হাল হকিকৎ জানা যেত। কিন্তু, সে গুড়ে বালি। তথাপি, এটা তো নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে অ-সংগঠিত অ-কৃষিক্ষেত্রে দেশের মোট কর্মসংস্থানের প্রায় ৯৪ শতাংশের ভার বহন করছে (ILO, India Report)।

অন্যদিকে, দেশের অভ্যন্তরে কার্যকরী চাহিদা বৃদ্ধি না পাওয়া এবং রফতানী বাণিজ্য ক্রমশঃ সংকুচিত হওয়ার কারণে সংগঠিত শিল্পের প্রত্যাশিত মুনাফা হার নিশ্চয়ই কমেছে। না হলে দেশে সঞ্চয়-হার যথেষ্ট

হলেও — GDP-র প্রায় ৩০ শতাংশ — বিনিয়োগ হার বাড়ছে না। GDP-র অনুপাত হিসাবে Gross Capital Formation (বা, পুঁজির পুঞ্জীভবন) ২০১১-১২ থেকে ক্রমশ কমছে। বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার এই অধোগতি রুখতে পারেনি।

অনেকের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে যে, কার্যকরী চাহিদা যদি কমে যায় তাহলে মুদ্রাস্ফীতি বা মূল্যবৃদ্ধি হার এখনও কেন ৩-৪.৫ শতাংশ। একেই তো বলে Stagflation। অর্থাৎ, একদিকে আর্থিক গতি রুদ্ধ (stagnation) তার দোসর মূল্যবৃদ্ধি। রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ক্ষমতার বিন্যাস তো বাজারের চাহিদা-জোগান-এর অবস্থার ওপর নির্ভর করে পুনর্বিন্যাস হয় না। আড়তদার-মজুতদার তাদের ক্ষমতা আম-জনতার সঙ্গে ভাগাভাগি করে না। আর, একচেটিয়া পুঁজি (monopoly / oligopoly) তাদের উৎপাদিত দ্রব্যের দাম বাজারের চাহিদা জোগান-এর নিয়ম মেনে বাড়া-কমা করে না।

কৃষি উৎপাদনের উৎস স্থলে রয়েছে এক প্রতিযোগীতামূলক বাজার। যেখানে, চাহিদার অভাবে টম্যাটো কিলো প্রতি ৫০ পয়সা, পেঁয়াজ ১ টাকা, লঙ্কা ১ টাকা, আদা ১ টাকা, বেদানা ২০ টাকা। আর ক্রেতা কিনছে এর বহুগুণ বেশি দামে। উৎপাদক তার উৎপাদন খরচটাও ঘরে তুলতে পারছে না। সার, বীজ, কীটনাশক ইত্যাদির দাম তো বৃহৎ পুঁজি বাড়িয়ে চলেছে।

কার্যকরী চাহিদা যে কমে গিয়েছে তা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে সুরাটের হীরা শিল্প, কোয়েম্বাটোরের ছোট ও মাঝারি ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প, ইন্দোরের পোশাক শিল্প (এইসব NDTU-র সমীক্ষায় উঠে এসেছে)।

শেষ পরিসংখ্যান অনুযায়ী গড় মাথাপিছু বার্ষিক আয় তো ক্রমান্বয়ে বাড়ছে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে দেড় শতাংশের কম হারে। আর, সরকারের দাবী মতন GDP বৃদ্ধির হার ৭ শতাংশের বেশি। তাহলে তো গড় মাথাপিছু আয় সাড়ে পাঁচ শতাংশের বেশি হারে হতে হয়। দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না।

আসলে, কারণটা লুকিয়ে রয়েছে আয় বন্টনের চূড়ান্ত বৈষম্যর মধ্যে। গিনি-সহগ ব্যবহার করে আয় বন্টনের অসাম্য মাপা হয়। বিগত পাঁচ-সাত বছরে আয় বৈষম্য ক্রমান্বয়ে বেড়ে তা এখন ৪২ এর বেশি। উন্নত দেশগুলির কথা ছেড়ে দিলেও ভারতের মতন বহু উন্নয়নশীল দেশেও গিনি-সহগ বা আয় বৈষম্য এত বেশি নয়। মোট পরিমাণ জাতীয় আয়ে দেশের উচ্চ-কোটির ১ শতাংশে শেয়ার বা ভাগ হচ্ছে ২১ শতাংশের বেশি। আর, নিম্ন-আয়ভুক্ত ৫০ শতাংশ মানুষের কাছে পৌঁছায় জাতীয় আয়ের মাত্র ১৫ শতাংশ।

হিসাব করলে দেখা যায় যে দারিদ্ররেখার ১০ শতাংশ নীচে থেকে ১০ শতাংশ উপরের। অর্থাৎ দরিদ্রতম ২০ শতাংশের আয় বৃদ্ধি হার বার্ষিক ১ শতাংশের কম। আর, উচ্চতম ১ শতাংশ মানুষের মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি হার ৭ শতাংশ বা তার বেশি। নিয়মগিরি পর্বতমালার আদিবাসী বনবাসীদের জীবন-জীবিকা বাস্তুচ্যুত করে বেদান্ত শিল্পগোষ্ঠী প্রাকৃতিক সম্পদ লুঠ করে নিজস্ব সম্পদে পরিণত করেছে। রাষ্ট্রের পৃষ্ঠপোশকতায়।

জিডিপি ক্রমবৃদ্ধিকে কোন্ অবস্থায় গরিবমুখীন বা indusive বলে মেনে নেওয়া যায়? যখন এই বৃদ্ধি অন্ততপক্ষে সমানুপাতিক হারে গরিবদের উপকৃত করে। অর্থাৎ, যদি ৬-৭ শতাংশ হারে জিডিপি বৃদ্ধি

পেয়ে থাকে এবং একই হারে সর্বনিম্ন ২০ শতাংশের আয় বৃদ্ধি পায়। অন্যথায়, সমাজে বৈষম্য হবে ক্রমবর্দ্ধমান।

আয় ছেড়ে উপভোক্তা ব্যয়-এর পরিসংখ্যান দেখা যাক্। এখানেও শেষ সরকারী পরিসংখ্যান প্রকাশিত ২০১৫ সালে, যার সমীক্ষা সময়কাল ২০১১-১২ (NSSO)। কী বলছে সেখানে? ৬৪ শতাংশ গ্রামীণ জনসংখ্যার দৈনিক মাথাপিছু ব্যয় ৩৫ টাকার কম। এর মধ্যে ৪০ শতাংশ-এর ২৬ টাকার কম। শহরাঞ্চলে ৬৭ শতাংশ মানুষের দৈনিক মাথাপিছু ব্যয় ৬৬ টাকার কম। তো বাজারে চাহিদা সৃষ্টি হবে কীভাবে? আর, নতুন কর্মদিবস-ই বা হবে কীভাবে?

ফলে, দেশে আম-জনতার দৈনন্দিন জীবনের গুণগত মান এবং তাদের সক্ষমতা (Capabilities) কমছে। এর পরিমাপ করা হয় মানব উন্নয়ন সূচক ব্যবহার করে। যা গঠন করা হয় মাথাপিছু আয় (বন্টনের অসাম্য হিসাবের মধ্যে নিয়ে), জনস্বাস্থ্য (জন্মের সময় প্রত্যাশিত আয়ু), এবং শিক্ষা (গড় প্রতিজনে কত বছর শিক্ষালাভ করেছে), এদের পরিসংখ্যান ভিত্তি করে। ১৮৯ দেশের মধ্যে ভারতের স্থান ছিল, ২০১৬ সালে, ১২৯। ২০১৮ সালে আরও এক ধাপ নেমে ভারতের স্থান হয়েছে ১৩০ নম্বরে।

উন্নয়নের সংখ্যাতত্ত্ব ছেড়ে আসুন দেখে নেওয়া যাক্ বিগত পাঁচ বছরে মানুষের আশা-নিরাশার কথা। ব্যক্তি মানুষ কী ভাবছে। তাদের অনুভূতি উপলব্ধি সে কতটা সুখী বা তৃপ্ত বর্তমান শাসনকালে। তাদের নিজেদের কথায়।

রাষ্ট্রসংঘ-র উদ্যোগে প্রকাশিত হয় বিশ্ব সুখানুভব রিপোর্ট (বা, World Happiness Report)।

সুখানুভবের সূচক তৈরি করা হয় ব্যক্তির একান্ত নিজস্ব মতামত,

ছয়টি প্রশ্নের উপরে। যার মধ্যে রয়েছে গড় মাথাপিছু আয় (বাড়া বা কমা), সম্ভাব্য সুস্থ জীবনের প্রত্যাশা, ব্যক্তি জীবন কেমন হবে তা পছন্দ করার স্বাধীনতা, দেশে দুর্নীতি কতটা, ইত্যাদি (মোট নম্বর হয় ব্যক্তির দেওয়া নম্বর-এর যোগফল।)

সর্বশেষ প্রকাশিত রিপোর্ট অনুযায়ী ভারতবাসী খুবই অসুখী। ১৫৬টা দেশের মধ্যে ভারতের স্থান ১৪০ নম্বরে। ভারতের বেশিরভাগ মানুষের মনে হচ্ছে যে চারদিকে সবই প্রায় অপ্রীতিকর বা খারাপ। পরিবেশগত অবনয়ন। যেন কোন এক সর্বগ্রাসী অবস্থা, যেখানে প্রতিদ্বন্দ্বী রাজনৈতিক দলের যেন কোন স্থান নেই। আসলে, মানুষের উপলব্ধি সরকারী সংখ্যাতত্ত্বের মারপ্যাঁচে লুকিয়ে রাখা যায় নি।

২০০৫-২০০৮ এর তুলনায় ২০১৬-২০১৮ সময়কালে বিশ্বের যে পাঁচটি দেশে অবস্থার অবনয়ন সব থেকে বেশি তার মধ্যে অন্যতম ভারতবর্ষ। অন্য দেশগুলি হলো ইয়েমেন, সিরিয়া, বোতসোত্তয়ানা এবং ভেনেজুয়েলা।

পরিশেষে

যতটুকু হোক্ না কেন, রাজ্য কি তার দায় এড়াতে পারে। রাজ্য ও কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলগুলি নিয়েই তো ভারতবর্ষ। কেন্দ্রীয় ট্যাক্স-রাজস্বের প্রায় ৬০ শতাংশ তো সরাসরি চলে আসে রাজ্যগুলিতে। এর উপরে রয়েছে অতিরিক্ত নানা কেন্দ্রীয় প্রকল্পের অর্থ। যেমন, মনরেগা, সর্বশিক্ষা, মাধ্যমিক শিক্ষা, আবাস যোজনা, জনস্বাস্থ্য, ইত্যাদি। যদিও এই ধরনের অনেক প্রকল্পেই রাজ্যগুলিকে ৪০ শতাংশ খরচের দায় নিতে হয় (উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলিতে ১০ শতাংশ)।

প্রায়শই, ব্যর্থ রাজ্যগুলি মূলত যারা এইসব প্রকল্পগুলির ৪০ শতাংশ দায়ভার নিতে ব্যর্থ হয়েছে, অর্থাৎ সাধারণ মানুষকে সুযোগ লাভে বঞ্চিত করেছে, তারা কেন্দ্রের বঞ্চনা'র সুর চড়ায়। কিন্তু, আর পাঁচটা রাজ্যের সাথে তুলনামূলক উন্নয়ন তুলে ধরে না। বাংলায় বছরে, মনরেগা ব্যতিরেকে, কত নতুন কর্মদিবস সৃষ্টি করা হয়েছে তার সরকারি ভাষ্য গ্রহণযোগ্য নয়, কারণ বিনিয়োগ নেই। লাখে লাখে মানুষ কম মজুরীর কাজের সন্ধানে ভিন্ রাজ্যে পাড়ি দিচ্ছে। আর, মেধাশক্তি চলে যাচ্ছে ব্যাঙ্গালোর, চেন্নাই, হায়দ্রাবাদ, পুনে বা দিল্লীতে। চা-বাগান সহ বহু সংস্থা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে দাবিমত গুন্ডাট্যাক্স না দিতে পেরে। কেরালা, তামিলনাড়ু, কর্ণাটক এর মতো রাজ্যগুলি শিক্ষা-জনস্বাস্থ্যের মতো ক্ষেত্রে যা করতে পারে এ রাজ্য কেন তা পারে না তার পুরো দায়িত্ব নিশ্চয়ই কেন্দ্রীয় সরকারের নয়।

এতদ্ সত্ত্বেও, প্রকৃত পরিসংখ্যান কেন্দ্রীয় সরকার কেন সামনে আসতে দিচ্ছে না? উত্তর প্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, রাজস্থান এর মতন বড় রাজ্যগুলি সহ সিংহভাগ রাজ্যের পরিচালনাভার ২০১৭-১৮ সালে তো ছিল বিজেপি-র। নোট বন্দী এবং অ-পরিকল্পিত ভাবে জিএসটি প্রয়োগ যে দেশের সব রাজ্যের অর্থনীতিকে বড় ধাক্কা দিয়েছে। সর্বোপরি কৃষিজ পণ্যের সঠিক ন্যূনতম সহায়ক। সংগ্রহ মূল্য ঘোষণা করতে না পারা, যা কেন্দ্রের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। ☐

কাজ সৃষ্টির সংখ্যা ঃ ভারতে কর্মসংস্থান ও কাজ সৃষ্টির পরিমাণ নিয়ে বিতর্ক

পার্থপ্রতিম মিত্র

সাম্প্রতিক বছরগুলিতে ভারতে কর্ম সংস্থান ও কাজ সৃষ্টির সংখ্যা নিয়ে বিতর্কের প্রেক্ষিতে দেশে কর্মীদের সংখ্যা নির্ধারণের জন্য একটি শক্তিশালী তথ্য ব্যবস্থা অত্যন্ত জরুরি। এতদিন এই বিষয়টি একটি সরকারী নীতির মধ্যে আবদ্ধ থাকার ফলে এই বিষয়ে সব আলোচনাই প্রযুক্তির দৃষ্টিভঙ্গিতে একজন মানুষের কর্ম সংস্থানের অবস্থার জোরালো সূচক নির্ধারণে সীমাবদ্ধ ছিল।

কতকগুলি পরিভাষা যেমন Usual Status (অর্থাৎ প্রাসঙ্গিক সময় নিরীক্ষার আগের ৩৬৫ দিন), Current Weekly (নিরীক্ষার আগের ৭ দিন) এবং Current Daily Sratus (নিরীক্ষার আগে সপ্তাহের প্রতি দিন) এই সমীক্ষায় প্রাসঙ্গিক সময়ে একজন মানুষের চাকরিরত, চাকরিবিহীন অথবা চাকরি খুঁজতে অনিচ্ছুক অবস্থার তথ্য গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। এখন বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দু হল এই তিনটি সূচকের মধ্যে কোনটি সবচেয়ে ভালভাবে দেশের বর্তমান কর্মসংস্থান পরিস্থিতিকে নির্ধারণ করতে পেরেছে।

অন্যদিকে সাম্প্রতিক কালে জনসাধারণের উন্মুক্ত আলোচনায় বিষয়টির বিপরীত দিক প্রতিফলিত হয়েছে। বেতন তালিকার তথ্যের উপর ভিত্তি করে কর্মচারী প্রভিডেন্ড ফান্ড অরগানাইজেশন (EPFO), কর্মচারী রাজ্য বিমা করপোরেশন (ESIC) এবং রাষ্ট্রীয় পেনশন সিসটেম (NPS) কর্তৃক প্রকাশিত সাম্প্রতিক প্রতিবেদনে দেখা যাচ্ছে যে ২০১৭-১৮

অর্থবর্ষে EPFO সিসটেমে প্রায় ৫৫ লক্ষ (৫.৫ মিলিয়ন) নতুন সংখ্যা যুক্ত হয়েছে এবং গ্রাহকদের গড় বয়স ১৮ থেকে ২৫ বছর। (Towards a payroll reporting in India by prof. P. Ghosh and Dr. S K Ghosh www.iimb.ac.in. Jan 15 2018)

পূর্বতন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জয়রাম রমেশ ও প্রভিন চক্রবর্তি EPFOর তথ্যভিত্তিক কর্মসংস্থানের সংখ্যার সত্যতা সম্বন্ধে প্রশ্ন তুলেছেন। অন্যদিকে ঘোষ এবং ঘোষ তাদের আলোচনায় দেখিয়েছেন নভেম্বর ২০১৭ পর্যন্ত ৩৬.৮ লক্ষ EPFO নতুন গ্রাহক হয়েছেন যাদের বয়স ১৮ থেকে ২৫ বছর। ধরে নেওয়া যায় এই ১৮ থেকে ২৫ বছর বয়সী মহিলা বা পুরুষ যাঁরা তাদের নাম নথিভুক্ত করেছেন তারা সকলেই সংগঠিত সংস্থায় কাজ পেয়েছেন। নভেম্বর ২০১৭ তথ্য এবং ২০১৭-১৮ পূর্ণ অর্থবর্ষে তথ্যের বিশ্লেষণ করে তাঁরা অনুমান করেছেন ২০১৭-১৮ অর্থবর্ষে ৫৫.২ লক্ষ নূতন কর্মসংস্থান হয়েছে।

রমেশ ও চক্রবর্তি বলেছেন এই বিশ্লেষণে অনেক ত্রূটি রয়েছে : নতুন কোন ১৮ থেকে ২৫ বছর বয়সী শ্রমিক EPFO র গ্রাহক হলেই এটা অনুমান করার কারণ নেই যে নতুন কর্মসংস্থান হয়েছে। অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় বহু অসংগঠিত শ্রমিক রয়েছেন যাদের কোন সামাজিক সুরক্ষা নেই তারা শুধুমাত্র EPFO র গ্রাহক হয়ে সংগঠিত ক্ষেত্রের নতুন কর্মী হয়ে যাবেন এই ধারণাটি অবাস্তব। অসংগঠিত শ্রমিক রয়েছেন এবং শুধু মাত্র এই পদ্ধতিতে নতুন কর্মসংস্থান হওয়া অসম্ভব।

রমেশ ও চক্রবর্তি আরও বলেছেন ২০১৮ সালে GST প্রবর্তনের ফলে বাণিজ্যে আনুষ্ঠানিকীকরণের প্রচেষ্টা হয়েছে। ট্যাক্স ক্রেডিটের সুবিধা গ্রহণ করার জন্য সব বাণিজ্যিক সংস্থাকে GST নথিভুক্ত হওয়া বাধ্যতামূলক। তাঁদের মতে বাধ্যতা এড়াতে অনেক বাণিজ্যিক সংস্থা

তাদের খরচ কমাচ্ছে, কিছু ব্যবসা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। ঘোষ ও ঘোষ পদ্ধতি উপরোক্ত বাধ্যমূলক আনুষ্ঠানিকীকরণের কুফল বিবেচনা না করে শুধুমাত্র নূতন নিয়মিত কর্মীর সংখ্যাকে নতুন কর্মসংস্থান হিসাবে দেখিয়েছেন। রমেশ ও চক্রবর্তির মতে আসলে চারজন শ্রমিকের কাজ হারানোর পরিবর্তে এক জন অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিক সংগঠিত ক্ষেত্রে প্রবেশের সুযোগ পেয়েছে। এভাবেই ঘোষ এবং ঘোষ কর্মসংস্থানের চিত্রকে অতিরঞ্জিত করে আনুষ্ঠানিকীকরণের নতুন কর্মসংস্থান বলে দেখিয়েছেন এবং সিদ্ধান্তে উপনিত হয়েছেন যে ২০১৭ অর্থবর্ষে ভারতবাসী যথেষ্ট ধনী হয়েছেন এবং সামগ্রিক অর্থনীতি শক্তিশালী হয়েছে। আসলে নোট বাতিলের কারণে মানুষ তাদের টাকা ব্যাঙ্কে জমা করতে বাধ্য হয়েছেন, ফলে ২০১৭ অর্থবর্ষে ব্যাঙ্কের আমানত উল্লেখযোগ্য ভাবে বেড়েছে। অপরদিকে ব্যাঙ্ক আমানতের সঙ্গে টাকার অবমূল্যায়ন বিচার করে দেখা যাচ্ছে প্রকৃতপক্ষে ২০১৭ অর্থবর্ষে বৃদ্ধি ৫ শতাংশ কমেছে এবং ৭৬ শতাংশ বৃদ্ধির দাবি অতিরঞ্জিত। সুতরাং শুধু ব্যাঙ্ক আমানতের তথ্য বিচার করলে দেখান যায় ভারতবাসী সত্যিই ধনী হয়েছেন, যদিও এটা সত্যি নয়। EPFO এই ধারণার ভিত্তিতে ২০১৮ অর্থবর্ষে ৫৫ লক্ষ নতুন চাকরির গল্প বলেছে, পেশাগত ক্ষতি ও প্রবর্তিত আনুষ্ঠানিকীকরণের প্রতিফলন এই অনুশীলনে নেই। এটা পরিস্কারভাবে মিথ্যা এবং বিভ্রান্তিকর বলেছেন রমেশ ও চক্রবর্তি।

EPFO প্রকাশিত পূর্ববর্তী সময়ের তুলনায় বিরাট সংখ্যক কর্মসংস্থানের সাফল্যের তথ্যকে অস্বীকার করে জনসাধারণের মধ্যে আলোচনা শুরু হয়েছে এবং বিখ্যাত ব্যক্তিরা এই বিতর্কে অংশগ্রহণ করেছেন ফলে বিষয়টি আর নীতিনির্ধারক সংস্থায় আবদ্ধ নেই। খবরের কাগজেও এই বিতর্ক গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশিত হচ্ছে ফলে দেশে কর্মসংস্থানের

সংখ্যা বিশ্বাসযোগ্য ভাবে নির্ধারণের জন্য একটি শক্তিশালী তথ্য ব্যবস্থা গড়েতোলা অত্যন্ত জরুরি, যে তথ্যের ভিত্তিতে নীতিনির্ধারক সংস্থা রোজগার ও বেকারত্ব বিষয়ে নজরদারি ও সঠিক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে সক্ষম হন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে Bureau of labour Statistics রোজগার ও বেকারত্বের তথ্য প্রতি মাসে প্রকাশ করে, এই তথ্যের সাহায্যে তারা দেশের মূল্য স্থায়িত্ব ও বৃদ্ধির ভারসাম্য বজায় রেখে আর্থিক নীতি নির্ধারণ করে।

শিক্ষাবিদ ও নীতি বিশ্লেষকদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের স্বার্থে প্রতিটি তথ্য পরিসংখ্যান পদ্ধতির একটি তথ্য ইতিহাস থাকে। কর্মসংস্থান ও বেকারত্বের তথ্য প্রতি পাঁচ বছর অন্তর জাতীয় নমুনা জরিপ অফিস (NSSO) গৃহসমীক্ষার মাধ্যমে তৈরি করে চলেছে, এই পদ্ধতিকে (quinquenniel round) বা পঞ্চবার্ষিক চক্র বলা হয়। ১৯৫৫ সাল (৯তম) থেকে এই কার্যক্রম চলে আসছে এবং ২০১১-১২ অর্থবর্ষে (৬৮তম) শেষ বার এই সমীক্ষা হয়েছে। অবশ্য নীতিনির্ধারকরা কর্মসংস্থান ও বেকারত্বের বাৎসরিক তথ্যের প্রয়োজনিয়তা বোধ করছিলেন। ২০০৯-১০ সাল থেকে Labour Bureau ভারত সরকারের শ্রম মন্ত্রকের একটি প্রতিষ্ঠান কর্মসংস্থান ও বেকারত্বের বাৎসরিক সমীক্ষা শুরু করেছে এবং ২০১৫-১৬ সালে শেষ বার সমীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়াও ২০০৮ সালের সেপ্টেম্বরে বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দার প্রেক্ষিতে লেবার ব্যুরো প্রতিষ্ঠান ভিত্তিক Quarterly Enterprise Surveys (QES) চালু করেছে। প্রথমে ২৫০০ প্রতিষ্ঠানের নমুনা সংগ্রহের মাধ্যমে সমীক্ষা চালু হয়। বর্তমান QES নমুনা সংগ্রহের পরিধি বাড়িয়ে প্রায় ১১১৭৯ প্রতিষ্ঠানের নমুনা সংগ্রহ করছে এবং উৎপাদন, নির্মাণ, বাণিজ্য, পরিবহন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, হোটেল ও রেস্টুরেন্ট, আউটসোর্সিং ব্যবসা প্রমুখ প্রতিষ্ঠানের ওপর সমীক্ষা

চালাচ্ছে। কর্মসংস্থান ও বেকারত্ব সমীক্ষার তৃতীয় সূত্র হল দশ বছর অন্তর রেজিস্ট্রার জেনারেল অফ ইন্ডিয়ার জনসংখ্যার আদমশুমারি। আদমশুমারি থেকে আমরা জানতে পারি প্রধান কর্মী (যাদের কর্মসংস্থান ৬ মাসের বেশী) প্রান্তিক কর্মী (যাদের কর্মসংস্থান ৬ মাসের কম) এবং বেকার (যারা কোন রকম অর্থনৈতিক কাজের অংশীদার নয়)।

বেতন তালিকার তথ্যের উপর ভিত্তি করে কর্মসংস্থান নির্ধারণের সুবিধা হল EPFO প্রকাশিত মাসিক বেতনের তালিকা থেকে সহজে প্রতি মাসে তথ্য সংগ্রহ করা যায়, অন্য দিকে লেবার ব্যুরো থেকে তথ্য সব সময়ে সহজলভ্য নয়। যেহেতু বেতন তালিকার তথ্য সহজলভ্য সেটাই গুরুত্ব পাচ্ছে। কিন্তু বেতন তালিকায় তথ্য থেকে নতুন কর্মসংস্থানের দাবিগুলি বিতর্কের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

নমুনা সমীক্ষাগুলির গুরুত্ব হল অনেক দিন ধরে নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে করার ফলে একজন মানুষের কর্মসংস্থানের স্থিতি নির্ধারণ করা যায়। এরসঙ্গে কর্মসংস্থানের মৌসুমজনিত ওঠা পড়ার কারণ অনুধাবন করা সম্ভব হয়। ভারতবর্ষে এই তথ্য অত্যন্ত জরুরী কারণ এখানে এখনও সমগ্র কর্মীদের ৫০ শতাংশ কৃষিতে নিযুক্ত আছে। সর্বোপরি দেশের সমগ্র কর্মসংস্থানের ৯৩ শতাংশ অসংগঠিত ক্ষেত্রে নিয়োজিত আছে, সুতরাং নমুনা সংগ্রহ এবং তার বিশ্লেষণের কাজকে অবজ্ঞা করা অনুচিত, কারণ নীতিনির্ধারণের জন্য এগুলো খুব জরুরী। নমুনা সংগ্রহ এবং তার বিশ্লেষণের কাজ স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে উন্নত করলে তা সময়মত এবং নিয়মিত প্রকাশ করা সহজ হয়।

নীতি বিশ্লেষকরা কর্মসংস্থানের বিষয়ে ইদানিং গভীরভাবে চর্চা করছেন। এখানে প্রশ্ন ভারত কি দেশের যুবসম্প্রদায়ের জন্য যথেষ্ট কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা ছাড়াই উন্নয়নের পথে হাঁটছে? ভারতে অসংগঠিত ক্ষেত্রে নিয়োজিত শ্রমিকের সংখ্যা বিপুল, ফলে এখানে নিয়মিত সমীক্ষা করে তার তথ্য বিশ্লেষণ করে প্রতি মাসে প্রকাশ করা খুব কঠিন।

সম্প্রতি ন্যাশনাল স্ট্যাটিস্টিকাল কমিশনের একটি রিপোর্ট (মিন্ট, ৬ মার্চ ২০১৯) ফাঁস হয়ে যায়, সেখানে রয়েছে ভারতে বিগত ৪৫ বছরের ইতিহাসে বেকারত্ব ২০১৭-১৮ সালে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৬.১ শতাংশে। দেশের কর্মসংস্থান নিয়ে বিভ্রান্তির মধ্যেই সরকার প্রভিডেন্ড ফান্ড, ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ন, পেনসনের তথ্যের ভিত্তিতে এবং অসংগঠিত ক্ষেত্রে নিয়োজিত শ্রমিককে প্রভিডেন্ড ফান্ডের গ্রাহক দেখিয়ে বিপুল সংখ্যক কাজ সৃষ্টির দাবি করছে।

এই বিষয়ে চিন্তাবিদ ও সেন্টার ফর মনিটারিং ইন্ডিয়ান ইকনমির (CMIE) কর্তা শ্রী মহেশ ভ্যাস মনে করেন প্রভিডেন্ট ফান্ডের গ্রাহক সংখ্যা দেখিয়ে অসংগঠিত শ্রমিককে সংগঠিত বলে চালাবার চেষ্টা এবং নতুন কাজ সৃষ্টির দাবি করা কাজের কথা নয়, এর মাধ্যমে আসল চিত্রটা পাওয়া যায় না (http://www.ndtv.com.Feb 10 2019)। উনি বলেছেন, 'প্রভিডেন্ড ফান্ডের গ্রাহক হওয়া মানেই নতুন কর্মী হওয়া নয়, এরকম প্রায়ই দেখা যায় একজন পুরোনো কর্মী প্রথমবার প্রভিডেন্ড ফান্ডের গ্রাহক হলেন, আইন অনুযায়ী যে সংস্থায় ১৯ জন কর্মী আছেন তাঁরা প্রভিডেন্ড ফান্ডের গ্রাহক হওয়ার যোগ্য নন, নতুন একজন কর্মী যোগ হলে নিয়োগ কর্তা ২০ জনকে প্রভিডেন্ড ফান্ডের গ্রাহক করার জন্য আবেদন করতে পারেন। সুতরাং এখানে ২০ জন গ্রাহক হলেন কিন্তু শুধুমাত্র একজনের নতুন কর্মসংস্থান হল।

আরও একজন চিন্তাবিদের মতে প্রভিডেন্ড ফান্ডের গ্রাহক হওয়ার সঙ্গে নতুন কর্মসংস্থানের কোন পারস্পরিক সম্পর্ক থাকতে পারে না কারণ এদুটির মধ্যে যেসব পরিবর্তনশীল উপাদান রয়েছে সেগুলো বিভিন্ন জন বিভিন্ন ভাবে ব্যাখ্যা করতে পারেন।

CMIE স্ট্যাটিস্টিক্স অনুযায়ী ২০১৮ সালের ডিসেম্বর মাসে ভারতের বেকারত্বের হার বেড়েছে ৭.৪ শতাংশ এবং বেকার সংখ্যা বেড়েছে ১১০ লক্ষ যেটা আগের ১৫ মাসে সর্বোচ্চ। ভ্যাসের মতে বেকারত্বের হার নির্ণয়ের প্রকৃষ্ট উপায় হল গৃহসমীক্ষা যার মাধ্যমে সমস্ত বিভাগকে সামিল করা সম্ভব।

India's Unemployment Rate (ভারতে বেকারত্বের হার)

Year	Year	Unemploymenrt rates
2011-12	NSSO 68th round	2%
2015-16	Labour Bureau, 5th Employment-unemployment survey	5%
2017-18	NSSO Periodic Labour Force Survey, (which was officially withdrawn)	6.1%
Dec. 2018	CMIE statistics	7.4%

বিভিন্ন তথ্য সূত্র থেকে আমরা জানতে পারছি দেশে বেকারত্বের হার ক্রমাগত বাড়ছে। অন্যদিকে EPFO কর্তৃক সদ্য প্রকাশিত অবাস্তব

আজগুবি তথ্যের ভিত্তিতে বলা হচ্ছে দেশে নতুন কর্মসংস্থান বাড়ছে, এই রিপোর্ট অনুযায়ী বিগত ১৭ মাসে দেশে ৭১.৪৮ লক্ষ নতুন চাকরি সৃষ্টি হয়েছে। অর্থনীতিবিদরা মনে করছেন প্রতিটি চাকরি সৃষ্টির জন্য পুঁজি বিনিয়োগের প্রয়োজনীয়তা আছে কিন্তু দেশে এই সময়কালে মানানসই বড় পুঁজি বিনিয়োগ হয়নি, ফলে বিপুল সংখ্যক কর্মসংস্থানের তথ্য বিশ্বাসযোগ্য নয়।

বেকারত্বের হার বেড়ে যাওয়ায়, বর্তমানে সমীক্ষার পদ্ধতি এবং তার সংকলন নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। এত দিন এই বিষয়ে মাথা ঘামাবার প্রয়োজন হয়নি কারণ বেকারত্বের হার ২.২ শতাংশ বা তার কম ছিল। বেকারত্বের হার বৃদ্ধির ফলে সমীক্ষার পদ্ধতি নিয়ে প্রশ্ন তোলা হচ্ছে। আসল কথা যখন তথ্যগুলি মনোমত হচ্ছে না তখন সমীক্ষার পদ্ধতি নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করা হচ্ছে। সরকার পরীক্ষিত পদ্ধতিগুলো উন্নত করার বদলে যেগুলোতে নতুন কর্মসংস্থান সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ রয়েছে এরকম নতুন অপরীক্ষিত পদ্ধতি চালু করার চেষ্টা করছেন। ☐

কেন্দ্রীয় সরকার ও কেন্দ্রীয় শাসকদলের প্রচারে বারবার জনগণের উন্নতি / সরকারের ইতিবাচক পদক্ষেপ নিয়ে যেসব বক্তব্য তুলে ধরা হয় তার কয়েকটি বিষয় অতি সংক্ষেপে

পার্থপ্রতিম মিত্র

গুজরাট মডেল ঃ-

গুজরাটে রাজ্য সরকার বন্দর, রেল, বিদ্যুৎ, রাস্তা ইত্যাদি সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়নের দায়িত্ব সার্বিকভাবে বেসরকারি হাতে তুলে দিয়েছে। ভারতের অন্য কোন রাজ্য সরকার এরকম নীতি গ্রহন করেনি। ওখানে যোগাযোগ, পরিবহন ও উন্নত পরিকাঠামোর জন্য রাজ্য জুড়ে ভালো চওড়া রাস্তা, বন্দর, বিদ্যুৎ উৎপাদন, কিষাণ মান্ডি, গুদাম, সেচ ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে ফলে কচ্ছের মতো অনুন্নত জেলাতেও শিল্প স্থাপন ও পর্যটনের ভালো ব্যবস্থা হয়েছে। কিন্তু কোনকিছুই সরকারের নিয়ন্ত্রনে নেই। প্রাথমিক ভাবে এর ফলে গুজরাটের GDP বৃদ্ধির হার জাতীয় স্তরের ওপরে উঠলেও দেখা যাচ্ছে বিগত পাঁচ বছরে শিল্প ও পরিষেবা দুই বিভাগেই কর্মসংস্থান কমছে।

পিছিয়ে পড়া বর্গের সামাজিক অর্থনৈতিক জনগননা (SECC) ২০১১-১২ :

ভারতে OBC জনসংখ্যা প্রায় ২৭ শতাংশ, তাদের জন্য মানানসই উন্নয়ন বরাদ্দের দাবি বহু দিনের। ২০১০ সালে তদনীন্তন ইউ পি এ ২

সরকারের আমলে জোট সঙ্গী RJD র চাহিদা অনুযায়ী এই জনগননা হয়। কিন্তু গনণার তথ্য বিভিন্ন অনুন্নত জাতির সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থান উপলব্ধি এবং বিশ্লেষণ করার বদলে তাদের মধ্যে বিভেদকে উস্কে দেওয়া হলো এবং তাকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হচ্ছে।

লেবার কোড :

শ্রম আইনকে যুক্তিসঙ্গত ও সরলীকরণের নামে এটি শ্রমিক বিরোধী আইন, ন্যূনতম মজুরি প্রবর্তনের সঙ্গে যথেচ্ছ ছাঁটাইয়ের সুযোগ করে রাখা হয়েছে। কারখানায় বর্তমানে ১০০ জন শ্রমিক থাকলে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিস্‌পিউট আইন, ১৯৪৭ অনুযায়ী সুরক্ষা পাওয়া যায়, এই সংখ্যা বৃদ্ধি করে ন্যূনতম ৩০০ জন শ্রমিক থাকলে ছাঁটাইয়ের ক্ষেত্রে নতুন শ্রম আইনে শ্রমিকরা সুরক্ষা পাবে। নতুন শ্রম আইন লাগু হলে বহু কারখানা ID Act, 1947 এর VB ধারার বাইরে চলে যাবে, যেগুলো সহজেই বন্ধ করা যাবে এবং শ্রমিকরা স্বাস্থ্য, সুরক্ষা ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হবে। ❒